



পারিবারিক জীবনে ইসলাম

ভূমিকা

পরিবার মানুষের আদি সংগঠন। মানবতার সেই প্রথম সূচনা লগ্ন পারিবারিক গঞ্জিতেই শুরু হয়। আদি পিতা হযরত আদম (আ) ও আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ)-এর মাধ্যমেই এর প্রথম বিকাশ। পরিবারের প্রথম বিন্যাস ছিল স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে। তারপর ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এক আদম পরিবার থেকে উৎসারিত হয়েছে অগণন মানব সন্তানের বিন্যস্ত সংসার। তাই দৃঢ়তার সাথেই বলা যায়- পরিবারই সমাজ জীবনের ভিত্তি প্রস্তর (First Foundation Stone)। সামাজিক জীবনে সুষ্ঠুতা নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুষ্ঠুতার উপর। পারিবারিক পবিত্রতা ও সুস্থতার উপরই নির্ভর করে সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বময় মানব জাতির পবিত্রতা ও সুস্থতা। এই জন্য ইসলাম পরিবার ও পারিবারিক জীবনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কেননা, পবিত্র পারিবারিক পরিমণ্ডলেই মানব প্রেম-ভালবাসা, হে-মমতা এবং পরম শান্তি ও স্বস্তির সাথে জীবন-যাপন করে। এখানেই মানব শিশু তার মানবিক গুণাবলীর প্রশিক্ষণ লাভ করে। পারিবারিক জীবন কিভাবে সুন্দর, সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাপূর্ণ হয়- তার সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা ইসলামে রয়েছে। এ ইউনিটে তাই আলোকপাত করা হয়েছে।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হল-

- পাঠ-১ : ইসলামী পরিবারের পরিচয়
- পাঠ-২ : ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা
- পাঠ-৩ : ইসলামী পরিবারে পিতা-মাতার অধিকার ও কর্তব্য
- পাঠ-৪ : সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য
- পাঠ-৫ : স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য
- পাঠ-৬ : ভাই-বোনের অধিকার ও কর্তব্য



ইসলামী পরিবারের পরিচয়



উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- পরিবার কাকে বলে বলতে পারবেন।
- ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- ইসলামী পরিবারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারবেন।

১.১ পরিবার-এর পরিচয়

পরিবার এর সংজ্ঞা নিরূপণে সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইবার বলেন: “স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের অতি সংক্ষিপ্ত অথচ স্থায়ী প্রতিষ্ঠান-ই হচ্ছে পরিবার।” মনীষী এয়ারিস্টটলের মতে, “পরিবার একটি অতি স্বাভাবিক মানবীয় সংস্থা। কেননা, এর মূল নিহিত রয়েছে মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনের গভীরে।” অগবার্ণের সংজ্ঞায়, “সন্তান-সন্ততিসহ বা সন্তান-সন্ততিহীন দম্পতি দ্বারা গঠিত সংঘকে পরিবার বলে।” স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, মাতা-পিতা, ভাই-বোন প্রভৃতি একানুভুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে পরিবার। পরিবার-সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রাথমিক স্তর। বৃহদায়তন পরিবার কিংবা বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বিত রূপ হচ্ছে সমাজ। কুরআনের বাণী অনুযায়ী- “প্রথম মানব আদম ও হাওয়া (আ)-কে কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে উঠেছিল।” এ প্রথম পরিবারের সদস্যদ্বয়কে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহর ঘোষণা ছিল :

“হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে একত্রে বসবাস কর এবং যেখান থেকে ইচ্ছে অবাধে পানাহার কর।” (সূরা বাক্বার : ৩৫)

এভাবেই গড়ে উঠেছিল মানব ইতিহাসের প্রথম ও আদি পরিবার। আর এ পরিবার থেকেই বিশ্বময় কালক্রমে ছড়িয়ে পড়েছে অগণিত মানব। যেমন আল্লাহর ঘোষণা : “হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মাত্র পুরুষ মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জুড়ি সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের উভয়ের থেকে অগণিত পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন।” (সূরা নিসা : ১)

১.২ ইসলামী পরিবার-এর পরিচয়

ইসলামী পরিবারের সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায় : “যে পরিবার ইসলামী ভাবধারা, ইসলামী নীতিমালা ও ইসলামী বিধি-বিধানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং পরিচালিত হয়, তাকে ইসলামী পরিবার বলে।” ইসলামী পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকেই মুসলিম হতে হবে। অমুসলিম ইসলামী পরিবারের সদস্য হতে পারবে না। অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তা ইসলামী পরিবার হবে না। অথবা তাদের কেউ যদি কখনও ইসলাম ত্যাগ করে, তবে তখন আর সে ইসলামী পরিবারের সদস্য নয়। এমনিভাবে কোন ছেলে-মেয়ে যদি ইসলাম গ্রহণ না করে বা ইসলাম ত্যাগ করে অন্য আদর্শ গ্রহণ করে- তবে সেও ঐ মুসলিম পরিবারের মধ্যে গণ্য হবে না। যেমন হযরত নূহ (আ)-এর পুত্র কেনান যখন মহাপ্রাবনের সময়

ডুবে যাচ্ছিল- তখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেছিলেন: رَبِّ إِنِّي أَبْنَىٰ مِنْ أَهْلِى

“হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা হূদ : ৪৫)

(তখন) আল্লাহ বলেন :

يُنَوِّحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ

“হে নূহ! নিশ্চয়ই সে আপনার পরিবারভুক্ত নয়। নিশ্চয়ই সে অসৎপরায়াণ।” (সূরা হূদ : ৪৬)

এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ইসলামী পরিবারের সদস্য হতে হলে শুধু পুত্র-পরিজন হলেই চলবে না বরং তাকে হতে হবে মুসলিম ও সৎকর্মশীল।

ইসলামী পরিবার গঠিত হয় স্বামী ও স্ত্রী থেকে। মহান আল্লাহ সৃষ্টির সবকিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন- যাতে করে বংশ বৃদ্ধি হতে পারে পরিবার থেকে। মানব পরিবার গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

“বিবাহ কর মহিলাদের মধ্য হতে যাদেরকে তোমাদের পছন্দ হয়।” (সূরা নিসা : ৩)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“আপনার পূর্বে অনেক নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদের জন্য স্ত্রী ও সন্তানের ব্যবস্থা করেছি।” (সূরা রাদ : ৩৮)

হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“বিবাহ হচ্ছে আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত মোতাবেক আমল করেনা সে আমার উম্মত নয়।” (মুসনাদে আহমদ)

বিবাহের মাধ্যমেই নর-নারীর সম্পর্ক স্থাপন করে পরিবার গঠন করা হয়। ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা বিশ্ব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুই আল্লাহ জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। যেমন- আল্লাহর ঘোষণা :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“মহান পবিত্র সত্তা সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন- উদ্ভিদ ও মানব জাতির মধ্য হতে এবং এমন সব সৃষ্টি থেকে যে সম্বন্ধে তোমরা কিছুই জাননা।” (সূরা ইয়াসীন : ৩৬)

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

“প্রতিটি বস্তুকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।” (সূরা যারিয়াত : ৪৯)

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا

“এবং তিনিই মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন।”

(ফোরকান:৫৪)

একটি আদর্শ পরিবার গঠনে যে সব উপাদানের প্রয়োজন তার সবকিছুই ইসলামে বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা পরিবার ব্যবস্থাকে সুন্দর সুষ্ঠু ও শান্তিময় করে গড়ে তোলার জন্য অনেক নিয়ম-নীতি এবং বিধি-বিধান নায়িল করেছেন।

পরিবার ব্যবস্থা ছাড়া সভ্যতা মূল্যহীন। ইসলামী সমাজ গঠনে ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.৩ ইসলামী পরিবারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

ক. বিশ্ব প্রকৃতির শাস্ত্র রূপ

বিয়ে ও দাম্পত্য জীবন বিশ্ব প্রকৃতির এক স্বভাব সম্মত বিধান। এটা এক চিরন্তন ও শাস্ত্রত ব্যবস্থা- যা কার্যকর রয়েছে বিশ্ব প্রকৃতির পরতে পরতে প্রতিটি জীব ও জড়বস্তুর মধ্যেও। কুরআনের ঘোষণা :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

“প্রত্যেকটি বস্তুকেই আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি।” (সূরা যারিয়াত : ৪৯) মুসলিম পরিবার তাই এ বিশ্বনীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আপন ও প্রিয়জন নিয়ে মিলেমিশে বসবাস করার মধ্যেই রয়েছে শান্তি, সুখ, তৃপ্তি, নিশ্চিন্ততা ও আনন্দ। এ কারণেই মানুষ আদিকাল হতেই সমাজভুক্ত পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত। ইসলামী পরিবার কুরআন সুন্নাহর নীতির ভিত্তিতে তথা ইসলামী জীবন বিধান মত গড়া। আল্লাহর বিধানের আওতায়ই স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সন্তান জন্মদান করে। আর এ বিধান মতই একে অন্যের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

খ. পারস্পরিক দায়িত্ববোধ

মুসলিম পরিবারের প্রত্যেক সদস্যেরই যথারীতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। একে অপরকে সৎ কাজে উপদেশ ও উৎসাহ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। অভিভাবক ইসলামী ভাবধারায় পরিবার পরিচালনা করবে। বড়রা ছোটদের উত্তম বিষয়গুলো শিক্ষা দেবে। জীবনে চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে পরস্পর পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এমনকি, মহান প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইসলামসম্মত সকল কর্তব্য ও দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে হবে।

ইসলামী পারিবারিক জীবনে পুরুষকে পরিবারের কর্তা বা অভিভাবক নিযুক্ত করে তার উপর ভরণ-পোষণ, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়-দায়িত্ব অর্পণ করেছে। যেমন- মহান আল্লাহর ঘোষণা

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“পুরুষ নারীর কর্তা।” (সূরা নিসা : ৩৪)

ইসলামী পরিবারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল যে, ইসলামী পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। এ পরিবারের কর্তা থাকেন পিতা। পিতার অনুপস্থিতিতে মাতা বা বড় ভাই।

ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সহায়ক ও সম্পূরক। এরা একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। একে অন্যের পরিপূরক ও পরিপোষক। একে অন্যের সম্মান ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

هُنَّ لِبَاسٌ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِّهِنَّ

“স্ত্রীরা তোমাদের ভূষণ, আর তোমরা তাদের ভূষণ।” (সূরা বাকারা : ১৮৭)

ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্বের ক্ষেত্র ভিন্ন। পুরুষের কর্মক্ষেত্র বাইরের অঙ্গন। আর পরিবারের অভ্যন্তরের দায়িত্বে থাকবে নারী।

মহানবী (স) বলেন,

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِمْ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“স্ত্রী তার স্বামীর পরিজনদের এবং সন্তানদের তত্ত্বাবধানকারিণী তাকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে।” (বুখারী, মুসলিম)।

স্ত্রী ; স্বামীর সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি ও সংসার সম্পর্কে সচেতন থাকবে। সর্বদা তাঁর আনুগত্য সহকারে কাজ করবে। এ মর্মে মহানবীর (স) বাণী : “স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও তার সন্তানাদির অভিভাবিকা।”

গ. ভক্তি-সম্মান ও হে-মমতার উৎস স্থল :

মুসলিম পরিবার ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল সদস্যের প্রতি দাবী করে শ্রেণীমত ভক্তি-সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং আদর-স্নেহ, মমতামাখা আচরণ। বড়রা ছোটদের স্নেহের পরশ দিয়ে মানুষরূপে গড়ে তুলবে। আর ছোটরা বড়দের সাথে সম্মান দিয়ে তাদের মেনে চলবে। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন : “যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়।”

মুসলিম পরিবারের প্রকৃতি হলো পারস্পরিক প্রীতি-ভালবাসা, দয়া-সহানুভূতি ও প্রেমই মুসলিম পরিবারে এনে দেয় স্বর্গ-সুখ। ইসলামী পরিবার একটি শান্তির নীড়। ইসলামী পরিবার একটি অনন্ত শান্তি নিকেতন, তৃপ্তি আর প্রশান্তির আবাসভূমি। আল্লাহ বলেন : “আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম, ভালবাসা ও করুণার সঞ্চর করে দিয়েছেন।” (সূরা রুম : ২১)

ঘ. আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা :

পরিবার আমাদের আর্থ-সামাজিক ও দাম্পত্য জীবনের নিরাপত্তা এনে দেয়। পরিবারবিহীন মহা শূন্যতা ও নিরাপত্তাহীনতা মানুষকে নোঙরবিহীন নৌকার মতো স্থিতিহীন করে দেয়।

পারিবারিক জীবনের মধ্যেই মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা হয়। সমাজ-সভ্যতা ও মানবতার অগ্রগতি পারিবারিক জীবনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। সুতরাং সমাজ-সভ্যতার ও মানবতার ভিত্তি স্তর হচ্ছে এ পরিবার।

ইসলামী পরিবারে সবাই বৈধ উপার্জন করে কিনা, পরিবারের কর্তা সেদিকে খেয়াল রাখেন। মহানবী (স) বলেছেন-

كَشَبَ الْحَالِ فَرِيضَةً بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

“হালাল উপার্জন ফরযের পরেও ফরয।” (বায়হাকী)

ইসলামী পরিবার একটি জবাবদিহিমূলক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। পরিবারের সকলের কাজ কর্মের এবং অধিকার ও কর্তব্যের যেমন পরিবারে জবাবদিহি করতে হয়, তেমনি আল্লাহর দরবারেও জবাবদিহি করতে হবে।

ইসলামী পরিবারে শিশুদের স্নেহ, মমতা, ভক্তি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি, সমবেদনা, উদারতা, ত্যাগ ইত্যাদি সামাজিক মানবীয় গুণাবলির প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। পারিবারিক জীবনে ছোট-বড় সকল সদস্যের নৈতিক চরিত্র গঠন ও উৎকর্ষ সাধনের এক বিশেষ সুযোগ রয়েছে। সন্তানকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার এটাই হলো শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন।

সার-সংক্ষেপ

পরিবার হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রথম ভিত্তি ও প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। একটি আদর্শ সমাজ-সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য সুষ্ঠু পূত-পবিত্র পারিবারিক জীবন অত্যন্ত জরুরি। একটি আদর্শ পরিবার গঠনে যেসব উপায় উপকরণ দরকার তার সব কিছুই ইসলামে বিদ্যমান। তাই ইসলামী পরিবার প্রথা এক অনিবার্য ব্যবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : এক কথায় উত্তর দিন।

১. সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইবার পরিবারের সংজ্ঞায় কী বলেন?
২. মনীষী এয়ারিস্টটলের মতে পরিবারের সংজ্ঞা কী?
৩. কুরআনের বাণী অনুযায়ী প্রথম পরিবার কখন থেকে গড়ে উঠেছিল?
৪. প্রথম পরিবারের সদস্য কয়জন এবং কে কে ছিলেন?
৫. ইসলামী পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে কী হতে হবে?
৬. স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যদি কেউ ইসলাম গ্রহণ না করে বা ইসলাম ত্যাগ করে তখন ঐ পরিবারকে কী করতে হবে।
৭. হযরত নূহের (আ) পুত্র কেনান কি তাঁর পরিবারের সদস্য ছিল? কেন ছিলনা?
৮. মানুষ আদিকাল হতেই কেমন জীবনে অভ্যস্ত?
৯. ইসলামী পরিবারে স্বামী ও স্ত্রীর দায়িত্বের ক্ষেত্র কোথায় কোথায়?
১০. ইসলামে পরিবার প্রথা কী?

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বিভিন্ন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পরিবারের সংজ্ঞা দিন।
২. ইসলামী পরিবারের পরিচয় দিন।
৩. ইসলামী পরিবারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরুন।
৪. “পরিবার বিশ্ব প্রকৃতির শাস্ত্ররূপ” ব্যাখ্যা করুন।



ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব ও প্রয়োজন



উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ইসলামী পরিবারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।
- ইসলামী পরিবারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১ ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব

সুষ্ঠু, সুন্দর, সুখী, সমৃদ্ধশালী আদর্শ জাতি ও সমাজ বিনির্মান ইসলামী পারিবারিক জীবনের অন্যতম উদ্দেশ্যে। সুষ্ঠু জাতি গঠনের জন্য সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন অপরিহার্য। উত্তরকালে মুসলিম জাতির যে অভ্যুদয় ঘটে তার মূলে ছিল পারিবারিক দৃঢ়ভিত্তি এবং পারিবারিক জীবনের সুস্থতা ও পবিত্রতা। সুতরাং পারিবারিক জীবনই হল ইসলামী সমাজের রক্ষাদুর্গ।

আল্লাহ মানব জাতিকে তাঁরই দাসত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করার জন্যই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। আর আল্লাহর বিধান পালন শুরু হয় পারিবারিক জীবন থেকে।

ক. পরিবার সদস্যদের প্রশিক্ষণালয়

পারিবারিক জীবনকে মানব-সভ্যতা ও প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র বলা হয়। কেননা, একটি শিশু আশৈশব মানবীয় গুণাবলী, সৌজন্যবোধ, আচার-আচরণ, বিনয়, পরোপকার, ত্যাগ, নিষ্ঠা, নিয়ম-শৃঙ্খলা ইত্যাদি পারিবারিক পরিবেশেই শিক্ষা লাভ করে থাকে। যা পরবর্তীতে জীবন চলার দিশারী হয়। ইসলামী পারিবারিক ব্যবস্থায় এর সদস্যদের বিশেষ করে সন্তান-সন্ততিদেরকে শৈশব হতে ইসলামের শিক্ষায় প্রশিক্ষণ ও তা জীবনে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করাও পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য।

খ. আশ্রয় ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে

এ বিশাল সংসারে ক্ষুদ্রায়তন পরিবারই একটি মানুষের আশ্রয় স্থল। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আহার-বিহার, নিদ্রা, প্রেম-ভালবাসা প্রভৃতি পারিবারিক পরিমণ্ডলেই অনুভূত হয় বেশি। তাই নিবিড় আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে মানুষ পরিবার গঠন করেছে।

পারিবারিক জীবনে পরিবারের সকল শ্রেণীর সদস্যদের নিরাপত্তা অব্যাহত থাকে। মান-সম্মান, ইজ্জত-আবরু, খাওয়া-পরা, সাহায্য-সহানুভূতি, শিক্ষা-দীক্ষা, জীবন প্রভৃতির দায়-দায়িত্ব সানন্দে পারিবারিকভাবে পালন হয়ে থাকে। একজন অক্ষম হলে অপরজন তা, আন্তরিকভাবেই পালন করে। এমন নিবিড়তা ও নিরাপত্তা অন্যত্র দেখা যায় না। পরিবার একটি দেহের ন্যায় আর সদস্যরা এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; তাই পরস্পরের নিরাপত্তার জন্য পরিবারের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। পরিবারের সদস্যদের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপদে-আপদে, অক্ষমতায় কোন সদস্যই অসহায় বোধ করে না। সকল অবস্থায় পরিবারের সদস্যগণ একে অপরের সুখ-দুঃখে এগিয়ে আসে। তার ভরণ-পোষণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। পরিবারে বৃদ্ধরা শুধু সহানুভূতিই পায় না, ইসলামী পরিবারে তারা সম্মানের পাত্র।

গ. পূত-পবিত্র জীবন যাপন

ইসলামী দাম্পত্য জীবন নারী-পুরুষকে কুপ্রবৃত্তি, পশুবৃত্তি উচ্ছৃঙ্খলতা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার ইত্যাদি পাপমুক্ত জীবনের অভিশাপ থেকে রক্ষা করে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন- “তারা (স্ত্রীগণ) তোমাদের ভূষণ এবং তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) ভূষণ।” (সূরা বাকারা : ১৮৭)

তাই পারিবারিক জীবনকে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের রক্ষাকবচ বলা যায়। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ আবর্তনশীল, তাই তার প্রয়োজন স্থায়ী সঙ্গী-সাথী ও অকৃত্রিম বন্ধু। এ প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে মানুষ স্থায়ী সম্পর্ক ও নিবিড় বন্ধন স্থাপনের জন্য ঘর বেঁধেছে- পরিবার গঠন করেছে। পবিত্র দাম্পত্য জীবনের মাধ্যমেই পারিবারিক সম্পর্কের স্থায়ী বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ. মানবিক গুণাবলীর লালন ক্ষেত্র

ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা মানবিক গুণাবলীর লালন ভূমি। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতা, আদর-স্নেহ, সমঝোতা, উদারতা, সহায়তা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, আদব-কায়দা, সাহায্য-সহযোগিতা, কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, তাহযীব ও তামাদ্দুন ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটে। এগুলো বৃহত্তর সমাজ-সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখে এবং সুষ্ঠু সমাজ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ঙ. শান্তির নিবাস

ইসলামী পরিবার এক অনাবিল শান্তির নিবাস। পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন সবাই মিলে সুখ-শান্তিতে বসবাস করার প্রতিষ্ঠানই হলো পরিবার।

এ সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা বলেন— “তঁার নিদর্শনসমূহের এও যে, তিনি তোমাদের মধ্যে থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও সহৃদয়তা সৃষ্টি করেছেন”। (সূরা রুম : ২১)

চ. মানব সভ্যতার লালন ক্ষেত্র

ইসলামী পরিবার মানব সভ্যতার লালন ভূমি। স্বামী-স্ত্রী প্রীতিময় পূত-পবিত্র পারিবারিক পরিমণ্ডলে শিশুর জন্ম হয়। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের হৃদয় নিংড়ানো আদর স্নেহ ও মায়া মমতায় লালিত হয়ে বড় হয়। আদব-কায়দা শেখে। উন্নত শিক্ষা দীক্ষায় গড়ে ওঠে। ভিত্তি ভাল হলে, তার জীবনও সুন্দর হয়। মাতা-পিতা তথা পরিবারের সহায়তা না পেলে সে শিশু সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠে না। উন্নত দেশগুলোতেও পারিবারিক বন্ধন নেই বলে সেখানকার অবস্থা আজ বড়ই হতাশা ব্যঞ্জক।

২.২ পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা**ক. সমাজ জীবনের প্রাথমিক ইউনিট পরিবার**

বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান পরিবার। ব্যক্তি জীবনে যে সব সৎ গুণ অর্জন করা হয়, পারিবারিক জীবনেই তার পরিচর্যা হয়ে থাকে। ব্যক্তি জীবন ভাল না হলে যেমন ভাল পরিবার গঠিত হয় না, তেমনি ভাল পরিবার না হলে, আদর্শ ও সুন্দর সমাজ গঠিত হয় না।

ইসলামী পরিবারে বন্ধ্যাহীনতা, দায়িত্বহীনতা এবং উচ্ছৃঙ্খলার কোন স্থান নেই। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সমঝোতা, সহযোগিতা, স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি গুণাবলী আদর্শ সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত। আর এ সব গুণের অনুশীলন ও পরিচর্যা পরিবারেই হয়ে থাকে। সুতরাং ইসলামী সমাজ গঠনে ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

পরিবার হচ্ছে সমাজজীবনের প্রথম ভিত্তি ও প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। পরিবার নিয়ে সমাজ গঠিত। সুস্থ ও সুন্দর পরিবারের ওপরই সুস্থ ও সুন্দর সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন নির্ভর করে। সুষ্ঠু পারিবারিক জীবন একটি সুষ্ঠু রাষ্ট্রের প্রতীক। পরিবার মানুষের আদি ও আদিম সংগঠন। পরিবারকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বৃহত্তর মানব সমাজ। আদি পিতা হযরত আদম (আ) এবং আদি মাতা হযরত হাওয়া (আ) -ই সর্বপ্রথম পারিবারিক জীবন গঠন করেন।

খ. মানব জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য

মানব জীবনকে পরিপূর্ণতা দান এবং মানব সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে এবং তাদের ওপর খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেছিলেন। আর তাদের মধ্যে এক মধুর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সৃষ্টির শুরু থেকেই নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক, পরিপোষক, একে অপরের ভূষণ। এ পবিত্র উদ্দেশ্যে মহান আল্লাহ আদম (আ)-এর দেহের অংশ থেকে হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন—

“হে মানব জাতি, তোমাদের পতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদের একজন মাত্র মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার জুটি সৃষ্টি করেছেন। তাদের উভয় থেকে বহু পুরুষ ও নারীর বিস্তার ঘটিয়েছেন।” (সূরা নিসা : ১)

গ. সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য

সমাজে সুখে শান্তিতে সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য পরিবার এবং পারিবারিক বন্ধনের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিম পরিবারের ভূমিকা আরও বেশি। পারিবারিক জীবন মানুষের কুপ্রবৃত্তি, পশুবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, সীমালংঘন, অধিকার হরণ,

মানবের জীবন প্রভৃতি পশু-চরিত্র থেকে মুক্ত ও পবিত্র করে। মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল, কল্যাণকর ও পবিত্র গুণ-বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত করে।

ঘ. জাতি গঠন ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য

ইসলামী পরিবারে সদস্যদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা, সমঝোতা সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, মান-মর্যাদা, তাহযীব-তামাদুন, আদব-কায়দা, সাহায্য সহযোগিতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সৃষ্টি হয়। যা বৃহত্তর সমাজ ও জাতিগঠনে এবং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারিবারিক জীবনের তাৎপর্য বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন—

“আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হল তিনি তোমাদের থেকে তোমাদের স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ করতে পার এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে হৃদয়তা ও মমতা স্থাপন করে দিয়েছেন। (সূরা রুম : ২১) সমাজে সুখে শান্তিতে বসবাস এবং ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিশাল সৃষ্টি জগতের সব কিছুই আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারী এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। তিনি নিজেই বলেছেন,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

“আমি সব কিছুই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত : ৪৯)

ঙ. মানব সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য

অন্যান্য সৃষ্টি জগতের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য থাকলেও সৃষ্টি জগতের অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় মানব জীবনের ধারা স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত। মানুষের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে। মানব সভ্যতার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য মানব সমাজে মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি, মান-মর্যাদা, তাহযীব-তামাদুন, সভ্যতা-কৃষ্টি, বিবেক-বুদ্ধি, দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ, সাহায্য-সহযোগিতা ও সহানুভূতি ইত্যাদি গুণ-বৈশিষ্ট্যে লালন ও বিকাশ একান্ত আবশ্যিক। সভ্যতার অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য গুণাবলীর বিকাশ ও লালন ক্ষেত্র হচ্ছে সুশৃঙ্খল, বৈধ ও সুনিয়ন্ত্রিত বৈবাহিক সূত্রে গাঁথা পূত-পবিত্র পারিবারিক জীবন। এ পবিত্র পারিবারিক জীবন মানুষের কু-রিপু, পশুবৃত্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা, অধিকার হরণ, মানবের জীবন যাপন প্রভৃতি পশু চরিত্রকে শুধু দমনই করে না, বরং মানব জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুসংহত, সুশৃঙ্খল, কল্যাণমুখী এবং পূত-পবিত্র করতে সহায়তা করে। মানব প্রজন্মের ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে বিশ্ব সৃষ্টির প্রত্যেক প্রজাতিই তাদের প্রজন্ম, সন্তান ধারণ ও উৎপাদনের প্রচলিত ও প্রকৃতিগত নিজ নিজ জাতীয় সত্তার অস্তিত্ব ও সৃষ্টিশীলতা রক্ষা করে চলেছে। বংশ বৃদ্ধি করে চলেছে। আর এ সৃষ্টিশীলতাই হল বিশাল সৃষ্টি জগতের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চ. পশুত্ব ও মানবের জীবন থেকে পরিত্রাণ

নারী বল্লাহীন, অবাধ, অনিয়ন্ত্রিত মেলামেশা মানুষকে পশুত্ব ও মানবের জীবনের অতল অন্ধকারের আবর্তে নিক্ষেপ করে। ফলে গোটা মানব সমাজে যে মারাত্মক কুফল নেমে আসবে, তা থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায় থাকবে না। ইসলামী পরিবার প্রথা মানুষকে পশুত্ব ও মানবের জীবন থেকে পরিত্রাণ দেয়।

ছ. মানব শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ কেন্দ্র

মানব শিশু অত্যন্ত দুর্বল ও অসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে। পরিবারে অত্যন্ত মায়া মমতা ও স্নেহ-যত্নে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। পারিবারিক দৃঢ় বন্ধন ও লালন পালন ছাড়া তার দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও উন্নতি সম্ভব নয়। মাতা-পিতা সন্তানদের শুধু লালন পালনই করে না, তাদের লেখা-পড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, আদব কায়দা ও জীবন প্রতিষ্ঠায় একগুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সার-সংক্ষেপ

মানুষের জন্য পারিবারিক জীবন এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য প্রয়োজনীয় বিষয়। এছাড়া মানব জীবনের অস্তিত্ব বিকাশ অসম্ভব। মানব সভ্যতার উৎকর্ষ ও পূত-পবিত্র এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য ইসলামের পরিবার প্রথা এক অনিবার্য প্রয়োজন। ইসলামী পারিবারিক জীবনের উদ্দেশ্য হলো, পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে পবিত্র ও শান্তিময় জীবন যাপন করা এবং সন্তান-সন্ততিকে ইসলামী আদর্শে আদর্শবানরূপে গড়ে তোলা। যাতে সকলের জন্য ইহ-পরকালীন সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা ও প্রেমময় পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। কাজেই ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.২

ক. নৈব্যক্তিক প্রশ্ন : সত্য ও মিথ্যা লিখুন।

১. পারিবারিক জীবনই হল ইসলামী সমাজের রক্ষাদুর্গ।
২. পারিবারিক জীবন মানব সভ্যতা ও প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র।
৩. পারিবারিক জীবনে পরিবারের সদস্যদের নিরাপত্তা থাকে না।
৪. ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা মানবিক গুণাবলীর লালন ভূমি।
৫. উন্নত দেশগুলোতে পারিবারিক বন্ধন শিথিল বলে সেখানকার মানবিক অবস্থা খুবই উন্নত।
৬. পরিবার মানুষের আদি সংগঠন।
৭. মানব জীবনের পরিপূর্ণতা ও মানব সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য পরিবার অপরিহার্য।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ইসলাম পরিবারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
২. ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার গুরুত্ব তুলে ধরুন।
৩. ইসলামী পরিবার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।



ইসলামী পরিবারে পিতা-মাতার অধিকার ও কর্তব্য



উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সন্তানের প্রতি পিতামাতার অবদান নিরূপণ করতে পারবেন।
- পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কি কি কর্তব্য রয়েছে তার বিবরণ দিতে পারবেন।

৩.১ সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অধিকার

এ সুন্দর বিশ্বচরাচরে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার ন্যায় আপনজন আর কেউ নেই। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার পরেই পিতা-মাতাই সন্তানের জন্য সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানিত। পিতা-মাতার অসীলাতেই সন্তান এ মায়াময় বিশ্ব-সংসারের মুখ দেখতে পায় এবং তাঁদের আপত্য স্নেহ-মমতা মাখা যত্নে লালিত-পালিত হয়ে পরিপূর্ণ মানুষরূপে গড়ে ওঠে। সন্তানের জন্য পিতা-মাতাই করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সেরা উপহার। পিতা-মাতা সর্বাবস্থায়ই সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন।

পিতা-মাতা সন্তানের সবচেয়ে আপনজন। মানব সন্তান সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। পিতা-মাতা আপত্য মায়ামমতা ও স্নেহ-যত্ন দিয়ে লালন-পালন করে তিলে তিলে বড় করে তোলেন। মা সন্তান গর্ভে আসা থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

حَمَلْتَهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعْتَهُ كُرْهًا

“মা অতিকষ্টে সন্তান গর্ভধারণ করেছে এবং অসহ্য কষ্টের মধ্যে তাকে প্রসব করেছে।” (সূরা আহকাফ : ১৫)
সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে দুধ পান করার মেয়াদকাল পর্যন্ত মা যে দুঃখ কষ্ট হাসি মুখে বরণ করে থাকেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

حَمَلْتَهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَلَّهُ فِي عَمَامِينَ

“মা কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে সন্তানকে গর্ভধারণ করে থাকে এবং দু'বছর পর্যন্ত দুধ পান করায় থাকে।” (সূরা লুকমান:১৪)

সন্তানের জন্য পিতা-মাতার ত্যাগের শেষ নেই। নিজেরা না খেয়ে সন্তানদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সন্তানের অনু-বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা দিয়ে উত্তমভাবে মানুষরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অসুখ বিসুখে দিন-রাত কষ্ট করে সেবা-যত্ন করেন। সন্তানগণ যাতে জীবনে ভালভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে সেজন্য পিতা-মাতার চেষ্টা সাধনার অন্ত থাকে না। মানব শিশুর প্রতি আল্লাহ তা'আলার পরেই পিতা-মাতার অবদান।

৩.২ পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। বৈধ কাজে নির্দেশ পালনে পিতা-মাতার আনুগত্য করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করবে।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)

আল্লাহ তা'আলার কঠোর আদেশ হচ্ছে-

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

“আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।”

মায়ের গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে মহানবী (স) বলেন-

الْحَبَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمِّهَاتِ

“মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত।

অপর এক হাদীসে এসেছে : “তোমাদের পিতা-মাতা উভয়ের পায়ের কাছে রয়েছে তোমাদের জান্নাত।”

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি লাভের মধ্যে সন্তানের সাফল্য নির্ভর করে। মহানবী বলেন—

رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخْطُهُ فِي سَخْطِ الْوَالِدِ
“পিতার সন্তুষ্টিতে প্রতিপালকের সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।” (তিরমিযী)

পিতা-মাতার অবাধ্যতা অমার্জনীয় অপরাধ। এ অপরাধের জন্য দুনিয়াতে বা মৃত্যুর পূর্বেও এর শাস্তি দেয়া হয়ে থাকে।

মহানবী (স) বলেন— “আল্লাহ তা’আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সব গুনাহই ক্ষমা করে থাকেন, একমাত্র পিতা-মাতার অবাধ্যতার গুনাহ ব্যতীত। (বায়হাকী)

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের যেসব কর্তব্য পালন করতে হয় তার একটি বিবরণী এখানে দেয়া হল :

১. সদ্ব্যবহার

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা নফল নামায, সদকা, সাওম, হাজ্জ, ওমরা এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করার চেয়েও উত্তম।

২. সেবা যত্ন

পিতা-মাতার অসুখ-বিসুখ হলে যত্ন সহকারে সেবা-শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন।

৩. আহ্বানে সাড়া

পিতা-মাতা ডাকা মাত্র সাড়া দিতে হবে। সকলের আগে তাদের কথা পালন করতে হবে।

৪. বার্ষিক্য সেবা

পিতা-মাতা বার্ষিক্য উপনীত হলে তাঁদের বিশেষভাবে সেবা যত্ন করা প্রয়োজন। আল্লাহ তা’আলা বলেন— “তোমার সামনে তাঁদের একজন বা উভয়ই যদি বার্ষিক্য উপনীত হন, তবে তাঁদের প্রতি উহ! কথাটিও উচ্চারণ করবে না। তাঁদের সাথে কর্কশ ভাষায় কথা বলবে না। তাঁদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। তাঁদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে বিনয়ের সাথে বাহু প্রসারিত করে দাও। তাঁদের সেবায় আত্মনিয়োগ কর।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪)

পিতা-মাতা দরিদ্র বা অসহায় হলে তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ তা’আলা বলেন, “বলুন, তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় করবে।” (সূরা বাকারা : ২১৫)

৫. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

ইসলামে আল্লাহর শোকরগুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে।

“আর তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।”

৬. খিদমত করা

পিতা-মাতা যাতে সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারেন সন্তানের সেদিকে সুদৃষ্টি রাখতে হবে। হাদীসে এসেছে: “আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।” (তিরমিযী, হাকিম) :

هُمَا جَنَّتَكَ وَنَارَكَ

“মাতা-পিতা তোমার বেহেশত এবং দোষখ”

সন্তানকে সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার খিদমতে নিয়োজিত থাকতে হবে। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁদের খিদমত ও এ খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে। মহানবী (স) বলেন :

فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا

‘মায়ের পদতলে বেহেশত।’

পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করার জন্য বিশেষ তাগিদ দিয়ে আল্লাহ বলেন—

وَاخْفِضْ لَهَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

“তাঁদের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের বাহু অবনমিত কর।” (সূরা বনী ইসরাঈল-২৩)

৭. আদব ও সম্মান করা

মাতা-পিতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাঁদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। মহান আল্লাহর নির্দেশ :

“তুমি তাঁদের প্রতি উহ! (ঘৃণা বা দুঃখব্যঞ্জক) শব্দটিও বল না এবং তাঁদের তিরস্কার করা বরং তাঁদের সাথে অতি সম্মানের সাথে কথা বল।” (সূরা বনী ইসরাঈল: ২২)

৮. মান্য ও আনুগত্য করা

জীবনের সর্বক্ষেত্রে সর্বদা পিতামাতার আদেশ-নিষেধ মান্য করা ও তাঁদের আনুগত্য করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব তথা অপরিহার্য কর্তব্য।

তবে পিতা-মাতা যদি ইসলাম বিরোধী কোন কার্যকলাপ করার জন্য নির্দেশ দেন এবং এ ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ করেন, তাহলে সন্তান পিতা-মাতার এ অন্যায় আদেশ অমান্য করে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করবে; কিন্তু এমতাবস্থায়ও সন্তান পিতা-মাতাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না, তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে।

৯. আর্থিক সহায়তা দান

মাতাপিতাকে উত্তমভাবে আর্থিক সহায়তা দানের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ বলেন— “যে মালই তোমরা খরচ কর তার প্রথম হকদার বৃদ্ধ বয়সের অসহায় অবস্থাতে তাঁদের লালন পালনের দায়- দায়িত্ব সন্তানের উপর।”

১০. ক্ষমা প্রার্থনা ও দু‘আ করা

মাতা-পিতার অসহায় ও দুর্বল বয়সে এবং মৃত্যুর পরে নিজের শৈশবের কথা স্মরণ করে ভালবাসা ও রহমতের আবেগে বারবার আল্লাহর দরবারে তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ও দু‘আ করতে হবে এ বলে :

رَبِّ اَرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

“হে আমার প্রতিপালক! তাঁদের উপর রহম কর। যেমন শিশুকালে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।” (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৪)

১১. ওয়াদা, ওসিয়ত ও ঋণ আদায় করা

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাঁদের দাফন-কাফনের পর তাঁদের ওয়াদা-অসিয়ত এবং ঋণ থাকলে তা আদায় করা সন্তানের কর্তব্য।

পিতা-মাতার আত্মীয়, বন্ধুদের সাথে ভাল ব্যবহার, পিতা-মাতার অবর্তমানে পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুন্দর ব্যবহার করাও সন্তানের কর্তব্য।

সার-সংক্ষেপ

পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ হতে সন্তানের জন্য সেরা উপহার হলো পিতা-মাতা। পিতা-মাতা সন্তানের বেহেশত-দোযখ। তাই আল্লাহর পরেই তাঁদের স্থান। সুতরাং ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় পিতা-মাতার খিদমত, সম্মান, মহব্বত করা এবং তাঁদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসার সাথে সাথে ইহ-পরকালীন সৌভাগ্য হাসিল করা প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি লিখুন

১. আল্লাহ তাআলার পরেই সন্তানের কাছে শ্রদ্ধেয় হচ্ছে পিতা-মাতা / শিক্ষক-গুরুজন / বন্ধুবান্ধব।
২. সন্তানের জন্য করুণাময়, আল্লাহর পক্ষ থেকে সেরা উপহার স্ত্রী / সন্তান / পিতামাতা।
৩. সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে মানব সন্তান / পশুপাখি / জীব-জানোয়ার।
৪. আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরেই সমাজের প্রতি / স্ত্রী-পরিজনের প্রতি / পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বে পালন করতে হয়।
৫. পিতা-মাতা যদি ইসলাম বিরোধী কাজ করার জন্য আদেশ দেন, তা পালন করা সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য / কর্তব্য নয়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সন্তানের প্রতি পিতামাতার অবদান নিরূপণ করুন।
২. পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৩. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কী কী কর্তব্য রয়েছে তার বিবরণ দিন।



সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য



উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- সন্তানের প্রতি মায়ের কর্তব্যসমূহ তুলে ধরতে পারবেন।

৪.১ সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব কর্তব্য

মুসলিম পরিবারে পিতাই প্রধান অভিভাবক। পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব অভিভাবক হিসেবে তাঁর উপরই ন্যস্ত। মূলত মুসলিম পরিবারে পিতার ভূমিকা সর্বাধিক ও দীর্ঘ মেয়াদী।

ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের জন্য এবং সুখ-শান্তিময় জীবন-যাপনের জন্য নর-নারীকে বৈধ ও অনুমোদিত বৈধ দাম্পত্য জীবন-যাপন করতে হবে। নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের কারণে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে তা সামাজিকভাবে স্বীকৃত নয় এবং মানব সমাজ ও সভ্যতার জন্য তা মারাত্মক পরিণাম বয়ে আনে। শিশু-সন্তানের স্বাভাবিক সুস্থ-বিকাশের জন্য সন্তানের পিতামাতার মধ্যে সম্প্রীতিময় দাম্পত্য-জীবন একান্ত অপরিহার্য। পিতামাতার মধ্যে মনোমালিন্য ও কলহ বিবাদ থাকলে সন্তানের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সন্তানাকাজক্ষী পিতাকে সন্তান গর্ভে থাকাকালে সন্তানের মঙ্গলার্থেই গর্ভধারিণী মাতার স্বাস্থ্য রক্ষা, সুস্থ দেহ, মন-মানসিকতা গঠন ও পবিত্র রাখা এবং হালাল খাওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

১. প্রাথমিক কর্তব্য

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই পিতার ওপর কতগুলো গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য এসে পড়ে যা- পিতাকে অবশ্যই পালন করতে হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই শিশুর ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত ধ্বনি শোনান।

৭ম দিবসে ইসলাম সম্মত নাম নির্বাচন করা ও সামর্থ্য অনুযায়ী আকীকা করা। ছেলে সন্তানের সময় মত খাৎনা করানো।

২. পরিচর্যা ও লালন-পালন

হৃদয় নিংড়ানো ঐকান্তিক দরদ, ভালবাসা ও স্নেহ মমতার কোমল পরশে সন্তানদেরকে অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করা। এ মর্মে আল্লাহর ঘোষণা: “সন্তান ও জননীর ভরণ-পোষণের ভার পিতার উপরই ন্যস্ত।”

শিশু-সন্তান মহান আল্লাহর বিশেষ নি'আমত এবং তাঁর পক্ষ হতে পিতা-মাতার নিকট রক্ষিত আমানত। তাই সন্তানের জীবনের নিরাপত্তা, চিকিৎসা, রোগ মুক্ত রাখা, স্বাস্থ্যবানরূপে গড়ে তোলা এবং জীবনের উন্নতি ও বিকাশকল্পে পিতাকে যথোপযুক্ত দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩. শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দান

সুসন্তান হচ্ছে- জান্নাত বাগিচার পুতুল। শিশুরাই হচ্ছে উম্মাহর প্রস্ফুটিত ফুল- মানবতার ভবিষ্যৎ। সুতরাং সন্তানের সুশিক্ষাই মুসলিম পিতার সর্বপ্রধান কর্তব্য।

মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত কয়েকটি বাণী : “কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার জন্য একটি উত্তম নাম রাখবে ও আদব কায়দা শিক্ষা দেবে।”

“সাত বছর বয়স হলে তোমরা সন্তানদেরকে নামাযের আদেশ কর। দশ বছর বয়সে প্রয়োজনে শান্তি দিয়ে নামায আদায় করাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।” সন্তানকে সুনাসরিক করে গড়ে তোলার জন্য সন্তানকে প্রথম থেকেই আদব-কায়দা ও সৌজন্যতা শিক্ষা দেয়া ও পিতার কর্তব্য। মহানবী (স) বলেছেন: “সন্তানকে সুশিক্ষা বা আদব-আখলাক শিক্ষা দান করাই সন্তানের জন্য পিতার শ্রেষ্ঠ উপহার।”

৪. পুত্র-কন্যায় পার্থক্য না করা

পিতা-পুত্র ও কন্যার মধ্যে আদর-যত্ন, স্নেহ-মমতার ব্যাপারে কোন রকম পার্থক্য করবে না। বরং উভয়কে সমানভাবে স্নেহ আদর করবেন। এমনকি কন্যা সন্তানকে একটু বেশি আদর-যত্ন করাও সুন্নাহ।

সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলে পিতা তার বিবাহের ব্যবস্থা করবেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন- “সন্তান বয়োপ্রাপ্ত হলে বিবাহ দিবে- অন্যথা কোন পাপে লিপ্ত হলে পিতা দায়ী হবে।”

কোন কারণে কন্যা যদি স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় কিংবা বিধবা বা অসহায় অবস্থায় পড়ে- তাকে সাদরে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-আশ্রয় ও ভরণ-পোষণ করবেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে যে “কন্যা যদি তোমার নিকট অসহায় হয়ে ফিরে আসে তবে তার জন্য খরচ করাই তোমার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকা।”

৫. সন্তানের কল্যাণ কামনা করা

পিতা সর্বদা সন্তানের কল্যাণকামী হবেন এবং তাদের সৎপথে চালাবেন। তাদের জন্য দু'আ করবেন। মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- তোমরা সন্তানদের বিপক্ষে কখনো বদ দু'আ করোনা। মহান আল্লাহ কুরআনে শিক্ষা দিয়েছেন: “হে প্রভু! তুমি আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে নামায প্রতিষ্ঠাকারী বানাও। প্রভু আমার! তুমি দু'আ কবুল কর।”

মানব শিশু আল্লাহর নিয়ামত। কাজেই কখনও তাদের জন্য বদ দু'আ করা উচিত নয়। সন্তান কোন অন্যায় আচরণ করলে তা সংশোধন করে দেওয়া পিতার কর্তব্য। মহানবী (স) বলেছেন :

لَا تَدْعُوا عَلَىٰ وَلَدِكُمْ

“তোমরা সন্তানদেরকে বদ দু'আ করোনা।” -(মুসলিম)

৬. ধর্মের পথে পরিচালনা

ধর্মের পথে পরিচালনা : সন্তানকে ধর্মের পথে, সৎ, সুন্দর ও ন্যায়ের পথে পরিচালনা করা পিতার অন্যতম কর্তব্য। মহানবী (স) বলেছেন- “তোমরা সন্তানকে ৭ বছর বয়সের সময় নামাযের আদেশ দেবে এবং ১০ বছর বয়সের সময় প্রয়োজনে মারবে।” (আবু দাউদ)

সন্তানকে তাওহীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং যাবতীয় শিরক থেকে দূরে রাখা পিতার দায়িত্ব। হযরত লুকমান (আ) যেভাবে তাঁর সন্তানকে শিরকমুক্ত থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন- ঠিক তেমনিভাবে সকল পিতার ভূমিকা হওয়া উচিত।

হযরত লুকমান (আ) বলেছিলেন- আল্লাহর বাণী :

يٰۤاِبْنِي لَا تُشْرِكْ بِاِلٰهِ ۙ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ

“হে বৎস! আল্লাহর সাথে শিরক করো না। নিশ্চয়ই শিরক মারাত্মক যুলুম।” (সূরা লুকমান - ১৩)

৭. বিলাসিতামুক্ত জীবনে অভ্যস্ত করা

সন্তানকে কষ্ট সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় উপযুক্ত করে গড়ে তোলা উচিত। কেননা, সন্তানকে প্রথম থেকে বিলাসিতা ও অলস প্রবণ করে গড়ে তোলা সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য মারাত্মক হতে পারে। কাজেই পিতাকে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪.২ সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্য

১. গর্ভধারণ : বিশ্ব প্রভুর অপার করুণায় এক মানব শিশু তার গর্ভে আশ্রয় নিচ্ছে- তাকে সানন্দে সাদরে গ্রহণ করতে হবে জননীকে। তিনি তার দেহ মন ও মানসিকতাকে সুস্থ, পূত-পবিত্র এবং কলুষমুক্ত রাখবেন।

২. পরম মুহে প্রতিপালন : একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথে শাখা যেরূপ তার মূলের প্রতি মুখাপেক্ষী, শিশুও তেমনি মায়ের দিকে মুখাপেক্ষী। ইসলাম শিশুকে দুগ্ধ দান করার জন্য মাকে নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ পাক বলেন : “আর যে স্ত্রী ন্যাকাল পূর্ণ করতে চায় তার জন্য জননীগণ তার সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর স্তন্য দান করবে।” (সূরা বাক্বারা-২৩৩) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতা সন্তানকে হৃদয়ের দরদ ও পরম স্নেহ যত্ন সহকারে লালন পালন করবেন। মনে কোন মানা না রেখে নিজ হাতে সন্তানের পরিচর্যা করবেন।

সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব মাতার ওপরই ন্যস্ত। যেহেতু শিশুরা মায়ের সান্নিধ্যে বেশিক্ষণ থাকে এবং তার সাথে প্রথম কথা বলতে শুরু করে তাই মাতাই হলেন শিশুর প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

মমতার সাথে মাতাও সন্তানকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের সহযোগিতা করবেন। আর কারণ বশত: যদি পিতা মারা যান, তবে মাতাকে এককভাবে এ গুরু দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৩. ধর্মীয় শিক্ষা দান : একজন মা তার সন্তানকে উত্তমভাবে ধর্মীয় শিক্ষার ওপর শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারেন। নিজে ধর্মীয় জীবন যাপন করে দৃষ্টান্ত হতে সন্তানকে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান এবং দুআ-কালাম শিক্ষা দিতে হবে। অযু-গোসল, পাক-নাপাক ইত্যাদি বিষয়ে মাকেই শিক্ষা দিতে হবে।

৪. আদব-কায়দা ও সৌজন্য শিক্ষা : সুস্থ-সবল সন্তান গড়ে তোলার জন্য সন্তানের পরিচ্ছন্নতার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা দিতে হবে। নিজেও পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

শিশু-সন্তান মাকে বেশি অনুসরণ করে। কাজেই শিশু সন্তানকে আদব-কায়দা সৌজন্যবোধ শিখাতে হবে। সুন্দর আচার-আচরণে গড়ে তুলতে হবে। শিশুকে ভদ্রতা, বিনয়, সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্জনে সহায়তা দিতে হবে।

৫. মানসিক গঠন : শিশুর মানসিক বিকাশে মায়ের ভূমিকা সীমাহীন। মা তার সন্তানের মন-মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে। মায়ের উন্নত চিন্তা, রুচি, ভাষা, ভাবধারা, আদব-কায়দা, তাহযীব-তামাদ্দুন-কৃষ্টি-সভ্যতা, ঐতিহ্য, আচার-আচরণ ইত্যাদি শিশুর মন-মানস গড়ে তোলার সহায়ক হয়। কাজেই মাকে শিশুর মানসিক গঠন ও বিকাশে উত্তম ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. ব্যবহারিক শিক্ষা : দৈনন্দিন অনেক কাজ আছে- যা মা শিশুকে সহজে শেখাতে পারেন। নিজেদের ব্যবহৃত কাপড়-চোপড় গোছানো, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, অযু-গোসল করে পাক-সাফ হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে পারেন। বিশেষ করে মেয়ে সন্তানকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মে অভ্যস্ত করে তোলা রান্না-বান্না ও অন্যান্য কাজের শিক্ষা দিয়ে দক্ষ ও সুনিপুণ গৃহিনী করে গড়ে তুলতে পারেন।

৭. তত্ত্বাবধান : একজন আদর্শ মাতার সবচেয়ে বড় কর্তব্য হচ্ছে তার সন্তানদের তত্ত্বাবধান করা। সন্তানদেরকে সু-মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর কাজ করে যাওয়া। মাকেই মমতাময়ী ভূমিকা নিয়ে সন্তানকে উত্তমরূপে গড়ে তুলতে হবে। কেননা, ইসলাম মাকে গৃহের দায়িত্বশীলরূপে স্থির করেছে। হাদীসে এসেছে তার এ দায়িত্ব সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে।

সার-সংক্ষেপ

সমাজে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মতেই পিতা-মাতা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবেন না। সন্তানের ভরণ, পোষণ, চিকিৎসা, অনু-বস্ত্র, শিক্ষা, সভ্যতা, চরিত্র গঠন ইত্যাদির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা পিতা-মাতারই দায়িত্ব। আর এ সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করতে পারলেই “পিতা-মাতার” মতো মহান আসনে সমাসীন হওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিল করুন	
১. পবিত্র মানব প্রজন্মের জন্য	১. কানে আযানের ধ্বনি দেয়া কর্তব্য
২. অবৈধ সম্পর্কের সন্তান	২. বিবাহের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।
৩. শিশু ভূমিষ্টের পরপর	৩. ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।
৪. সন্তান প্রাপ্ত বয়স্ক হলে	৪. মানব সভ্যতার জন্য মারাত্মক পরিণাম বয়ে আনে।
৫. সন্তানকে দুষ্ক দান করার ব্যাপারে মাকে।	৪. বৈধ দাম্পত্য জীবন যাপন করতে হবে।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ লিখুন।
২. সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহের বর্ণনা দিন।



স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য



উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- দাম্পত্য জীবনের পরিচয় দিতে পারবেন।
- স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ দিতে পারবেন।
- স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১ দাম্পত্য জীবনের পরিচয়

মানব সমাজে বৈধভাবে নর-নারীর একত্রে বসবাসকে দাম্পত্য জীবন বলে। এ মধুর দাম্পত্য জীবনে পুরুষ হয় স্বামী আর নারী হয় স্ত্রী। স্বামীর জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা পক্ষ হতে এক মহান নিয়ামত। আর স্ত্রীর জন্য স্বামীও আল্লাহ তায়ালা অপার রহমত। একজনের অভাব অপরজনের জন্য অসম্পূর্ণ ও অর্ধাংগ। এ কারণেই স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী, জীবন সঙ্গিনী ও সহধর্মিণী। অপর দিকে স্বামীও স্ত্রীর জন্য জীবন সঙ্গী, রক্ষক ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তারা একটি পাখির দুটি ডানার ন্যায় একে অপরের সহযোগী ও সম্পূরক। একজনকে ছাড়া আর একজনের কল্পনা করা যায় না।

তাই ইসলাম স্বামী-স্ত্রী নির্বিশেষে উভয়ের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণের জন্য কতিপয় অধিকার ও দায়িত্ব কর্তব্য বেঁধে দিয়েছে, যাতে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী থেকে আরো সুখকর ও মধুময় হয়ে ওঠে।

৫.২ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

মুসলিম পরিবারে স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ :

ক. উত্তম ব্যবহার :

পারিবারিক জীবনে স্বামীর প্রধান কর্তব্য হলো, স্ত্রীকে জীবনের প্রিয়তমা সাথী হিসেবে গ্রহণ করে নিজের সুখ-শান্তি, আনন্দ-বেদনায় সমানাধিকার দান করা। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা- “স্ত্রীদের ওপর যেমন স্বামীদের অধিকার আছে, তেমনি স্বামীদের ওপরও স্ত্রীদের অধিকার রয়েছে।”-(সূরা বাক্বারা: ১২৭)

জীবনের সকল অবস্থায়ই স্বামী-স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। তাকে কখনো ঘৃণা করবে না। এ মর্মে মহান আল্লাহর ঘোষণা- “তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার কর।”-(সূরা নিসা: ১৯)

স্ত্রী যদি অশিক্ষিতা হয়, তবে স্বামী তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দান করবে এবং নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল-হারাম, পাক-নাপাক ইত্যাদি জরুরি ও নিত্য প্রয়োজনীয় মাসালা শিক্ষা দেবে। আল্লাহ পাক বলেন- হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজদিগকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোষখের অগ্নি হতে বাঁচাও।”-(সূরা তাহরীম : ২)

যদি স্ত্রী কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে কিংবা ভুলবশত কোন অন্যায় করে ফেলে, তবে স্বামী তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেবেন এবং সংশোধন করে নেবেন।

খ. স্ত্রীর ভরণ-পোষণ :

স্বামী-স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং এ সম্পর্কে যাবতীয় ব্যয়ভার স্বামী নির্বাহ করবে। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা- ‘তোমরা যেখানে যে অবস্থায়ই বাস কর, স্ত্রীদেরকেও সেখানেই বসবাস করতে হবে।’-(সূরা আলাক : ২) মহানবী (স) এ প্রসঙ্গে বলেন- “তুমি যা খাবে, স্ত্রীকেও তা খাওয়াবে এবং তুমি যা পরবে স্ত্রীকেও তা পরতে দেবে।”-(আবু দাউদ)

গ. মোহরানা আদায় করা :

মোহরানা স্ত্রীর একটি প্রধান অধিকার এবং স্বামীর জন্য এটা একটা বড় ঋণ। সুতরাং এ মোহরানা আদায় করা স্বামীর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ ঘোষণা করেন- “তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীদের মোহরানা আদায় কর।”-(সূরা নিসা : ৪)

ঘ. স্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করা :

সংসার জীবনে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক। সুতরাং কোন অবস্থাতেই তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না। মহান আল্লাহর বাণী- “তারা তোমাদের ভূষণ এবং তোমরাও তাদের ভূষণ।” স্বামী-স্ত্রীর সহিত কখনো রক্ষ এবং কর্কশ ব্যবহার ও অসদাচরণ করবে না; বরং সর্বদা তার সাথে হাসিমুখে আমোদ-প্রমোদে উৎফুল্ল রাখার চেষ্টা করবে।

মহান আল্লাহ এ বিষয়ে বলেন, “তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর যদি তোমরা তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমন জিনিসকে ঘৃণা করবে, যাতে আল্লাহ পাক অনেক কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।”

স্ত্রীর গোপন কথা স্বামীর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ আমানত। সুতরাং কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করবেনা। এ সম্পর্কে হাদীসের নিষেধ বাণী রয়েছে।

স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকলে সকলের প্রতি সুযম ব্যবহার করতে হবে। যথাসম্ভব সব ব্যাপারে সমতা রক্ষা করতে হবে।

ঙ. স্ত্রীর অধিকার আদায়ে সচেতন হওয়া :

স্ত্রীর সকল অধিকার এমন সুষ্ঠুভাবে আদায় করতে হবে, যাতে তার সন্দেহের উদ্বেক না হয়। কারণ, ইসলাম স্ত্রীকে স্বামীর চরিত্রের সার্টিফিকেট প্রদানের অধিকার দিয়েছে। নবী করীম (স) বলেন— “তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।” স্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনের সাথেও ভাল ব্যবহার করা স্বামীর কর্তব্য। সকল সময় স্ত্রীর কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করাও স্বামীর অন্যতম কর্তব্য। ইসলামী পরিবারে স্বামী-স্ত্রী একটি পাখির দুটো ডানার ন্যায়। কাজেই একে অপরকে নিজের মত সমান মর্যাদার ভিত্তিতে আচরণ করতে হবে। স্ত্রীকে সদুপদেশ দান করাও স্বামীর কর্তব্য। ভাল কাজের জন্য স্ত্রীকে উদ্বুদ্ধ করতে ও মানবীয় গুণাবলীর বিকাশে প্রেরণা যোগাতে হবে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অমিল দেখা দিলে আপোষ-মীমাংসা সম্ভব না হলে স্ত্রীকে শরীআত সম্মতভাবে তালাক প্রদানের অধিকার দিতে হবে।

চ. স্ত্রীদের সম্পদ গ্রাস না করা :

স্ত্রীদের মোহরানার অর্থ অথবা পিতা-মাতা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কিংবা অন্য যেকোন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করা স্বামীর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আর স্ত্রীর এসব সম্পদ স্বামী কখনো গ্রাস করবেনা। স্ত্রী যদি খুশী মনে দেয় তাহলে তা নেয়া যায়। অন্যথা নয়। স্বামীর মৃত্যু হলে যাতে স্ত্রী তার সম্পদ থেকে উত্তরাধিকার পেতে পারে সে নিশ্চয়তা দেয়া।

ছ. নির্দোষ হাসি-তামাশা করা :

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা ও প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য স্ত্রীর সাথে গভীর হয়ে না থেকে নির্দোষ-হাসি তামাশা করা, খেলাধুলা করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে উপহার উপঢৌকন এনে দেয়া। এতে প্রেম ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়।

স্বামী এক নাগাড়ে চার মাসের বেশিদিন প্রবাসে থাকা অনুচিত। এতে স্ত্রীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। হযরত ওমর (রা:) চারমাসের অধিক স্ত্রীকে বিরহে রাখতে নিষেধ করেছেন।

৫.৩ স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. স্বামীর আনুগত্য :

পরিবারের শান্তি-শৃংখলা, রোজগার ও পরিচালনার দায়িত্ব যেহেতু স্বামীর ওপর ন্যস্ত, সেহেতু জীবনের সর্বাবস্থায়ই স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য স্বীকার করতে হবে। মহান আল্লাহর ঘোষণা : “পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্ব করবে, কেননা, আল্লাহ পরস্পরকে পরস্পরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এবং পুরুষেরা তাদের ধনসম্পদ স্ত্রীদের জন্য খরচ করবে।”

মহানবী (স) বলেন : “আমি যদি স্ত্রীকে আর কারো উদ্দেশ্যে সিজদা করতে আদেশ করতাম, তাহলে আমি স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজদা করতে আদেশ করতাম”—(তিরমিযী)

স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীকে সন্তুষ্ট ও খুশী রাখার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করবে। স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি নফল ইবাদত ছেড়ে দিতে হয় তাও করতে হবে। মহানবী (স) বলেছেন— “যার হাতে মুহাম্মদ (স)-এর জীবন সে সত্তার শপথ করে বলছি- স্বামীর হক আদায় না করে আল্লাহর হক আদায় করা যায় না।”

স্বামীকে যথোপযুক্ত সম্মান দেয়া স্ত্রীর অপরিহার্য কর্তব্য।

لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ

“কিছু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে।” (সূরা বাকারা : ২২৮)

পরিবার স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই অবদান রাখতে হবে।

যে কোন অবস্থায় স্বামীর আহবানে সাড়া দেয়া স্ত্রীর পবিত্র কর্তব্য। মহানবী (স) বলেন : “যখন স্বামী নিজ স্ত্রীকে নিজ প্রয়োজনে আহ্বান জানায়- তখন এতে সাড়া দেয়া স্ত্রীর দায়িত্ব হয়ে পড়ে। যদিও সে তন্দুর পাকানোর কাজে ব্যস্ত থাকে।”

সব সময় স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য ও বাধ্য থাকা অবশ্য কর্তব্য। নচেত স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধন থাকে না।

খ. সতীত্বের হিফায়ত :

স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর পবিত্র আমানত। সুতরাং কোন অবস্থাতেই স্ত্রী তার সতীত্ব বিনষ্ট করতে পারবে না। মহানবী (সা) বলেন- “স্ত্রী নিজের স্বার্থে কখনও স্বামীর আমানত খিয়ানত করবে না।”—(নাসাঈ)

মহান আল্লাহ এদের প্রশংসা করে বলেন : “সতী-সাধ্বী রমণীগণ স্বামীদের অনুগত হয়ে চলে এবং স্বামীদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ যা হিফায়ত করার জন্য বলেছেন তা হিফায়ত করে।” (সূরা নিসা: ২৫)

স্ত্রী কখনও স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বাড়ির বাইরে যাবে না- ইচ্ছামত ঘুরাফেরা করবে না। নিজের রূপ-লাবণ্য অপরকে প্রদর্শন করবে না। মহান আল্লাহর ঘোষণা : “তোমরা নিজগৃহে অবস্থান কর, আদিম জাহিলিয়াতের যুগের নারীদের মত সাজ-সজ্জা করে ঘরের বাইরে বের হয়োনা। (আল-আহযাব : ৩৩)

বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে অপর কোন পুরুষের সঙ্গে কথা-বার্তা বলা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে পর্দার আড়ালে থেকে কর্কশ ভাষায় অত্র কথায় বিদায় দেবে। মহান আল্লাহর নির্দেশ: “তোমরা যদি মুত্তাকিন নারী হও তবে বেশি মোলায়েম স্বরে কথা বলবে না, কেননা এতে যার অন্তরে রোগ আছে সে লোভ করতে পারে। সুতরাং বিধিমত কথা বলো।”-(সূরা আহযাব:৩২) প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে স্ত্রীকে শালীনতা ও পর্দা মেনে চলা অবশ্যই কর্তব্য। অশালীন অবস্থায় বাইরে বের হওয়া কুরুচির পরিচায়ক।

গ. স্বামীর সম্পদ সংরক্ষণ :

স্ত্রী-স্বামীর ধন-সম্পদকে নিজের নিকট গচ্ছিত আমানত স্বরূপ মনে করে আন্তরিকতার সাথে তার হিফায়ত করবে এবং কখনও অপচয় করবে না। মহানবী (স) বলেছেন : “স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে স্বামীগৃহের কোন সম্পদ ব্যয় করো না।”-(তিরমিযী)

স্ত্রী সর্বদা নিজহাতে স্বামীসহ স্বামীগৃহের সকল কাজ কর্ম সম্পাদন করবে এবং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধানসহ সন্তানাদির সেবা-যত্ন করবে।

মহানবী (স) বলেন : “স্ত্রীর স্বামীর পরিজনবর্গ ও সন্তানাদির অভিভাবিকা। তাকে এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। - (বুখারী. মুসলিম)”

ঘ. স্বামীর প্রতি সহানুভূতি :

স্বামী যদি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল না হয় এবং স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতে কষ্টবোধ করে তবে স্ত্রী স্বৈচ্ছায় তা কমিয়ে স্বামীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে হবে। আর স্বামী অপারগ হলে তা স্বৈচ্ছায় মাফ করে দিবে।

আল্লাহর বাণী : “স্ত্রীগণ যদি খুশি মনে মোহরানার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তবে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করতে পার।” - (সূরা নিসা: ৪)

ঙ. গোপনীয়তা রক্ষা :

স্বামীর কোন গোপন কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে স্বামীকে লজ্জিত না করা,

স্বামীর দেয়া উপহার সাদরে গ্রহণ করা কর্তব্য। কোন অবস্থাতেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আবদার করে কিংবা স্বামীর দেয়া উপহার গ্রহণে অসন্তুষ্টি দেখানো উচিত নয়।

স্বামীর সাথে কলহ-বিবাদ করে অন্যত্র রাতি যাপন করা স্ত্রীর জন্য একেবারেই অনুচিত। এতে স্ত্রীর ওপর স্বামী নাখোশ হয়ে পড়বে এবং যে স্ত্রীর ওপর স্বামী নাখোশ হয়, তার ওপর ফেরেশতারাও অভিশাপ দেয় বলে হাদীসে এসেছে।

চ. স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ :

সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি সানন্দে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা স্ত্রীর ওপর কর্তব্য।

স্বামীর মর্যাদা রক্ষা করা এবং সর্বাবস্থায় স্বামীর প্রতি বিনয়াবনত থেকে নিবেদিত প্রাণ হওয়া স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য।

স্বামীর সেবা-যত্নে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই একজন আদর্শ রমণী জীবনের চরম সুখ অনুভব করবে।

ছ. স্বামীর অবর্তমানে দায়িত্ব পালন :

স্বামী যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে চার মাস দশ দিন শোক পালন করা এবং স্বামী গৃহ ত্যাগ না করা এবং অন্য স্বামী গ্রহণ না করা একান্ত কর্তব্য।

স্বামী মারা গেলে কোন ঋণ থাকলে কিংবা কোন অসিয়ত বা কর্তব্য বাকি থাকলে স্ত্রীর পক্ষে তা আদায় করা এবং স্বামীর অসম্পূর্ণ কর্তব্য সম্পন্ন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের নিদর্শন।

জ. তত্ত্বাবধান করা :

স্ত্রীকে স্বামী, সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য যাবতীয় ব্যাপার তত্ত্বাবধান করতে হবে। হাদীসে এসেছে :

الْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ هِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“স্ত্রী স্বামীর পরিবার পরিজনের ও সন্তানদের রক্ষক ও ধারক। তাকে এ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে হবে।” (বুখারী-মুসলিম)

ঝ. স্বামীর কল্যাণ কামনা :

সদা সর্বদা স্বামীর কল্যাণ কামনা করা স্ত্রীর কর্তব্য। স্বামীর মৃত্যু হলেও তাঁর জন্য দু'আ করা কর্তব্য। সর্বোপরি একজন মুসলিম আদর্শ স্ত্রীরূপে নিজেকে উপস্থাপন করা স্ত্রীর সর্বোত্তম কর্তব্য।

ঞ. স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্যবহার :

স্বামীর আত্মীয়-স্বজন বিশেষ করে স্বামীর পিতা-মাতার সাথে এবং স্বামীর ভাইবোন ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

ইসলাম পারিবারিক জীবনকে মধুময় করার জন্য পারস্পরিক যেসব বিধি-নিষেধ ও দায়িত্ব-কর্তব্য আরোপ করেছে, সেগুলোর মাধ্যমেই যথাযথভাবে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুখ অর্জিত হতে পারে। আর কেবল তখনই স্বর্গীয় সুখ আমাদের এ পুণ্য কুটিরে এসে ধরা দেবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৫**ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন : সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিন।**

- মানব সমাজে বৈধভাবে নর-নারীর একত্রে বসবাসকে বলা হয়-
ক. দাম্পত্য জীবন খ. বৈধ জীবন
গ. লিভ টু গেদার গ. পারিবারিক জীবন।
- স্বামীর জন্য স্ত্রী-
ক. এক বোঝা খ. কন্টক
গ. নিয়ামত ঘ. বিপদ
- স্ত্রী স্বামীর-
ক. অর্ধাঙ্গিনী খ. জীবন সংগিনী
গ. সহধর্মিনী ঘ. সব কটি ঠিক।
- মোহরানা স্ত্রীর একটি প্রধান অধিকার এবং এটা স্বামীর জন্য-
ক. একটা বড় ঋণ খ. বড় বিপদ
গ. বড় বোঝা ঘ. কিছুই না।
- স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর-
ক. ভোগের বস্তু খ. পবিত্র আমানত
গ. প্রশংসার বস্তু ঘ. গর্বের বিষয়।
- একজন মুসলিম আদর্শ স্ত্রী রূপে নিজেকে উপস্থাপন করা স্ত্রীর-
ক. সর্বোত্তম কর্তব্য খ. কর্তব্য
গ. দায়িত্ব ঘ. জন্য অপমান।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- দাম্পত্য জীবনের পরিচয় দিন।
- স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।
- স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কী কী? লিখুন।



ভাই-বোনের অধিকার ও কর্তব্য



উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ছোট ভাই-বোনের প্রতি বড় ভাই-বোনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- বড় ভাই-বোনের প্রতি ছোট ভাই-বোনের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিবরণ দিতে পারবেন।
- বোনদের প্রতি ভাইদের সাধারণ কর্তব্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- ভাইদের প্রতি বোনদের সাধারণ দায়িত্ব বলতে পারবেন।

৮.১ ভাই-বোনের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সমাজ-সভ্যতার প্রাথমিক ইউনিট পরিবার। পরিবারে আছে পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি রক্ত সম্পর্কীয় ও বৈবাহিক সম্পর্কিত আরও অনেক আপন জন। যারা আত্মার আত্মীয়-এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কীয় সবচেয়ে কাছের মানুষ হল ভাই-বোন। ইসলামী পরিবার প্রথায় ভাই-বোনের মধ্যে মিল-মহব্বত এক স্বর্গীয় ব্যাপার। পারিবারিক ও সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ভাই-বোনদের মধ্যে একের ওপর আরেক জনের রয়েছে পারস্পরিক অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য।

ছোট ভাই-বোনের প্রতি বড় ভাইদের দায়িত্ব কর্তব্যের কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হল-

ক. অভিভাবকের ভূমিকা

ছোট ভাই-বোনদের প্রতি বড় ভাইদের অভিভাবকসুলভ ভূমিকা পালন করা কর্তব্য। পিতা-মাতার অবর্তমানে বড় ভাইদেরকেই তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করতে হবে। কখনও তাদেরকে অসহায়ত্বের মধ্যে ঠেলে দেয়া যাবে না।

খ. শিক্ষা-দীক্ষায় সাহায্য করা

ছোট ভাই-বোনদের আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলার জন্য বড় ভাইগণ আশ্রয় চেষ্টা করবেন। বড় ভাই বোনদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল ছোটদেরকে সর্বাত্মক সুন্দর, আদর্শ ও পবিত্র মানুষরূপে গড়ে তোলা। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার পথ সুগম করা এবং ছোটদেরকে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা।

গ. আদর্শ স্থানীয় হওয়া

বড় ভাইগণ হতে হয় উদার, শালীন। ছোটরা বড়দের অনুসারী। সুতরাং ছোটদের প্রতি বড়দের ব্যবহার থাকবে সুন্দর, মার্জিত, আদর্শ স্থানীয়, চমৎকার ও উপদেশপূর্ণ।

ঘ. ছোটদের প্রতি হেতুশীল হওয়া

বড় ভাইগণ ছোট ভাই-বোনদের মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্ন দেবেন। এ পর্যায়ে বড়দের ও ছোটদের অধিকার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন :

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَاوَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া-মায়া প্রদর্শন করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের ইসলামী সমাজের সদস্যভুক্ত নয়।”

ঙ. হক আদায় করা

ছোট ভাই-বোনদের হক বা অধিকার আদায় করা বড় ভাইদের কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

“আর তুমি তোমার নিকট আত্মীয়দের অধিকার আদায় কর।” (সূরা বনী- ইসরাইল : ২৬)

চ. সাহায্য-সহযোগিতা করা

ছোট ভাই-বোনদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিংবা ছোট-ভাইবোন অভাবগ্রস্ত হলে, তাদের জন্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য। কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالْذِينَ وَالْآقَرِبِينَ

বলুন, “তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর, তা পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের জন্য কর।” (সূরা বাকারা : ২১৫)
কোন বিপদে পড়লে, অসুস্থ হয়ে গেলে বা অন্য যেকোন প্রয়োজনে ভাই-বোনরা পরস্পর সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। এটাই ইসলামের নিয়ম। মহানবী (স) বলেন :

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كُنَّا الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে লিপ্ত থাকে, আল্লাহ তা'আলাও ততক্ষণ তার সাহায্য করতে থাকেন।” (মুসলিম)
এক ভাই অপর ভাইয়ের সম্ভাব্য যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য এগিয়ে আসবেন। এটাই কাম্য। যেমন মহানবী (স) বলেন :

مَنْ كُنَّا فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন।” (বুখারী-মুসলিম)

ছ. অন্যায়-অবিচার না করা

ছোট-ভাই বোনদের প্রতি অন্যায়-অবিচার ও খারাপ আচরণ করা কখনও উচিত নয়। তাদের সাথে সদা-সর্বদা সম্ভাব বজায় রাখা কর্তব্য। ছোটদের অন্যায় ও ভুল-ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা কর্তব্য।

ভাই-বোনদেরকে কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নয়। তাদের সাথে কোন অবস্থায় কথা-বার্তা বন্ধ করা বা পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। হাদীসে এসেছে “তিন দিনের বেশি সময়ের জন্য তার ভাইকে পরিত্যাগ করা বৈধ নয়।” (বুখারী-মুসলিম)

চ.২ ছোট ভাই-বোনদের কর্তব্য

বড় ভাইগণ ছোট ভাই-বোনদেরকে মানুষ করেন, অভিভাবক হিসেবে বহু আদর-যত্ন সহকারে গড়ে তোলেন। কাজেই এ বড়-ভাইদের প্রতি ছোট-ভাই-বোনদেরও বহু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। যার দিক নির্দেশনা হচ্ছে—

ক. সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা

বড় ভাই-বোনদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা ছোটদের প্রধান কর্তব্য। পিতা-মাতার পরই বড় ভাই-বোন তাদেরকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা ও বহু পরিশ্রমে মানুষ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কাজেই তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, “সন্তানের কাছে পিতার যেমন মর্যাদা, ছোট ভাইদের কাছে বড় ভাই-বোনেরও তেমনি মর্যাদা।”

খ. মেনে চলা

বড় ভাইদের সম্মান করার সাথে সাথে তাদের আদেশ-নিষেধ মেনে চলাও ছোট ভাই-বোনদের একান্ত কর্তব্য। বড়দের আনুগত্যের মধ্যে ছোটদের কল্যাণ নিহিত। কাজেই সব সময় বড় ভাই-বোনদের সৎ উপদেশ ও নির্দেশ মত চলা একান্ত অপরিহার্য।

গ. অশোভন আচরণ না করা

কখনও কোন অবস্থাতেই বড় ভাই-বোনদের সাথে অশোভন, অসৌজন্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। মনে কষ্ট পায় বা অসন্তুষ্ট হয় কিংবা অসৌজন্য প্রকাশ পায় এমন ধরনের যাবতীয় আচরণ থেকে ছোট ভাই-বোনদেরকে বিরত থাকতে হবে। বড় ভাই-বোনদের সাথে কথা-বার্তা বা পরামর্শ প্রস্তাব রাখতে হলে তাও আদবের সাথে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বড়দের কথার ওপর কথা বলা অনুচিত। বড়দের ভুল হলেও আদবের সাথে তা বুঝিয়ে বলতে হবে।

ঘ. সদ্ব্যবহার করা

বড় ভাই-বোনদের সাথে সদ্ব্যবহার করা একান্ত অপরিহার্য। কখনও তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আত্মীয় স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। আর আত্মীয়ের মধ্যে ভাই-বোন অন্যতম। বড় ভাই-বোনদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা একান্ত কর্তব্য। তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করা অনুচিত। হাদীসে এসেছে—
“যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের ওপর আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হয় না।”

বড় ভাই-বোনদেরকে কোন ক্রমেই কষ্ট দেয়া বা বিরক্ত করা উচিত নয়। তারা কষ্ট দিলেও তাদেরকে কষ্ট দিতে ইসলাম নিষেধ করে দিয়েছে।

বড় ভাই-বোনদের সেবা-যত্ন করা ছোট ভাই-বোনদের কর্তব্য। তারা পীড়িত হলে, রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা বৃদ্ধ হয়ে গেলে তাদের যথোপযুক্ত সেবা যত্ন করা ছোট ভাইদের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

ঙ. সাহায্য-সহযোগিতা করা

বড় ভাই-বোনদের বিপদে-আপদে প্রয়োজনে তাঁদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে। তাদের আর্থিক প্রয়োজন মেটাতে হবে। তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদের সন্তান-সন্ততির প্রতি যত্ন নিতে হবে।

বড়-ছোট সকলের পারস্পরিক সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য : বড়-ছোট সকল ভাই-বোনদের পারস্পরিক যে সব সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হবে তা হল-

ভাই-বোন বড় হোক ছোট হোক সকলের পারস্পরিক কর্তব্য হচ্ছে কেউ কাউকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবে না। সদা-সর্বদা মিলে-মিশে থাকবে। একে অপরের সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে ভ্রাতৃত্বের গভীর বন্ধনে সর্বদা চলবে। কখনও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে ছিন্ন করবে না।

চ. পরস্পর শত্রুতা অমার্জনীয় অপরাধ

ভাই-বোনদের কর্তব্য হচ্ছে পরস্পর শত্রুতা করবে না। একে অন্যের বিরুদ্ধে লাগবে না। ঝগড়া-ফাসাদ করবে না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, “প্রত্যেক সপ্তাহে দুদিন সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। যে বান্দা তার ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে ছাড়া প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। বলা হয়, মিটমাট না করা পর্যন্ত এদের উভয়কে প্রত্যাখ্যান কর।” (মুসলিম)

ছ. গীবত না করা

ভাই-বোন পরস্পরের গীবত বা নিন্দা না করা সাধারণ কর্তব্য। এতে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ভাব নষ্ট হয়। কাজেই একে অপরের বদনাম অন্যায্য অভিযোগ, নিন্দা, ঘৃণা ইত্যাদি থেকে ভাই-বোনদেরকে বিরত থাকতে হবে।

জ. বিপদ বা অকল্যাণ কামনা না করা

ভাই-বোনদের মধ্যে কেউ কারও ক্ষতি, বিপদ, অকল্যাণ কামনা করা অনুচিত। কাউকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করা মারাত্মক অন্যায্য। হাদীসে আছে “যে অন্যের জন্য কুয়া কাটে সে কুয়ায় সে নিজেই পড়বে।” কাজেই নিজে তো ভাইয়ের অকল্যাণ কামনা করবেই না। এমনকি বিপদের মুখে বা শত্রুর কাছে আপন ভাইকে সোপর্দ করবে না। হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধ বাণী এসেছে। ভাই-বোনদের মধ্যে কেউ বিপদ-আপদে পড়লে খুশী হওয়া বিরাট অন্যায্য। হাদীসে এসেছে-

لَا تَظْهَرِ الشَّمَاتَةَ بِأَخِيكَ فَيُعَافِيهِ اللَّهُ وَيَبْتَئِلِيكَ

“তোমার ভাইদের বিপদে ভুমি আনন্দ প্রকাশ করো না। এ রূপ করলে আল্লাহ তাকে রক্ষা করবেন ও তোমাকে তাতে ফেলে দেবেন।” (তিরমিযী)

৮.৩ ভাইদের বোনদের প্রতি সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য

ভাইদের বোনদের প্রতি কতগুলো সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। তা হল-

ক. বিশেষ যত্ন নেয়া

ভাইদের বোনদের প্রতি প্রধান কর্তব্য হল বিশেষ যত্ন নেয়া। কেননা, বোনেরা পিতা-মাতার সংসার ছেড়ে অন্যের ঘরে স্বামীর সংসারে চলে যায়। সব কিছু ভাইদের কাছে থাকে। কাজেই ভাইদের উচিত বোনদের প্রতি করুণার সাথে বিশেষ যত্ন নেয়া। তাদের আদর আপ্যায়ন করা। বোনদের স্বামী ও আত্মীয়দের সাথে ভাল ব্যবহার করা।

খ. বোনদের হক বা অধিকার আদায় করা

যেহেতু পিতা-মাতার অবর্তমানে ভাইগণ সংসারের দায়িত্বে থাকেন। কাজেই বোনদের পাওনা বা হক এবং অধিকার যা কিছু তারা পাবে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেবে করে আদায় করা ভাইদের বড় কর্তব্য। আজকাল দেখা যায় মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও বোনদের হক ঠিকমত আদায় করে না। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বোনদের হক নিয়ে টালবাহানা করা উচিত নয়। এটা বড়ই গুনাহের কাজ।

৮.৪ বোনদের ভাইদের প্রতি সাধারণ দায়িত্ব-কর্তব্য

আবার বোনদের ভাইদের প্রতি কিছু সাধারণ দায়িত্ব কর্তব্য আছে। তা হল-

ক. ভাইদের সম্মান রক্ষা করা

যেহেতু ভাইয়েরা তার আপন বংশ ধারা রক্ষা করেন, তাদের প্রতি অনেক কর্তব্য পালন করেন, তাই ভাইদের প্রতি বোনেরা কোমল হৃদয়ের মমতা দিয়ে তাদের সেবা-যত্ন ও সম্মান রক্ষা করে চলা বোনদের কর্তব্য। পিতা-মাতার তথা আপন বংশের গৌরব যাতে বজায় থাকে সেভাবে ঐতিহ্য রক্ষা করে চলাফেরা করা উচিত।

খ. সদ্ভাব ও সু-সম্পর্ক বজায় রাখা

বোনেরা চলে যায় স্বামীর সংসারে। আর ভাইয়েরাই তার বংশধারা ও ঐতিহ্য রক্ষা করেন পিতা-মাতার ভিটে মাটিতে থেকে। কাজেই নিজেদের হক আদায়ের ব্যাপারে খুব কড়া-কড়ি না করা কর্তব্য। ভাইদের দুঃখ বেদনায় সহানুভূতি প্রদর্শন করা বোনদের দায়িত্ব। তাদের সাথে সদ্ভাব ও সু-সম্পর্ক যাতে বজায় থাকে সেভাবে আচরণ করা কর্তব্য।

সার-সংক্ষেপ

পৃথিবীতে ভাই-বোনের মত আপন জন আর কেউ নেই। পরিবারে পিতা-মাতার পরই ভাই-বোনদের স্থান। কাজেই ভাই-বোনদের মধ্যে যেসব দায়-দায়িত্ব আছে সেসব দায়িত্ব কর্তব্য পালনের মধ্যেই নিহিত আছে শান্তি ও সুখ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৪.৬

ক. নৈব্যক্তিক প্রশ্ন : সঠিক উত্তরটি বেছে নিন।

- যারা আত্মার আত্মীয়, এদের মধ্যে রক্ত সম্পর্কিত সবচেয়ে কাছের মানুষ হল-
ক. ভাই-বোন
খ. শ্যালক-শ্যালিকা
গ. স্বশুর-শাশুড়ী
ঘ. মামা-খালু।
- ইসলামী পরিবার প্রথায় ভাই-বোনদের মধ্যে মিল মহব্বত-
ক. এক কঠিন ব্যাপার
খ. এক স্বাভাবিক ব্যাপার
গ. এক স্বর্গীয় ব্যাপার
ঘ. এক অস্বাভাবিক ব্যাপার
- ছোট-ভাই-বোনদের প্রতি বড় ভাই-বোনদের-
ক. অভিভাবক সুলভ ভূমিকা পালন করা কর্তব্য
খ. বন্ধুসুলভ ভূমিকা পালন করা উচিত
গ. শত্রু ভাবাপন্ন ভূমিকা রাখা কর্তব্য
ঘ. অম্ল-মধুর সম্পর্ক রাখা উচিত।
- সন্তানের কাছে পিতার যেমন মর্যাদা, ছোট ভাইদের কাছে বড় ভাই-বোনদেরও তেমন-
ক. মর্যাদা
খ. সম্মান
গ. ভক্তি
ঘ. শ্রদ্ধা
- বোনদের পাওনা বা হক ভাইদের-
ক. না দেয়া উচিত
খ. খেয়ে-ফেললে দোষ নেই
গ. পুষ্কখানুপুষ্কখ আদায় করা কর্তব্য
ঘ. না দেয়ার জন্য টালবাহানা করা উচিত।

খ. সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. ভাই-বোনদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?
২. ছোট ভাই-বোনদের প্রতি বড় ভাই-বোনদের করণীয় কিছু আছে কী? লিখুন।
৩. বড় ভাই-বোনের প্রতি ছোট ভাই বোনদের দায়িত্ব-কর্তব্য কি হওয়া উচিত? বর্ণনা করুন।
৪. সাধারণভাবে বোনদের প্রতি ভাইদের কি কোন কর্তব্য আছে?
৫. ভাইদের প্রতি বোনদের কি দায়িত্ব আছে? লিখুন।

ছড়ান্ত মূল্যায়ন-৪

বিশদ উত্তর-প্রশ্ন :

১. ইসলামী-পরিবার কাকে বলে? ইসলামী পরিবারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোকপাত করুন।
২. ইসলামী পরিবারের গুরুত্ব লিপিবদ্ধ করুন।
৩. ইসলামী পরিবারের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরুন।
৪. ইসলামী পরিবারে পিতা-মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য লিখুন।
৫. পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহের বিবরণ দিন?
৬. সন্তানের প্রতি পিতার দায়িত্ব-কর্তব্য কী কী? লিখুন।
৭. সন্তানের প্রতি মায়ের করণীয় কিছু আছে কী? লিখুন।
৮. দাম্পত্য জীবন কী? ইসলামী পরিবারে স্বামীর দায়িত্ব-কর্তব্য বর্ণনা করুন।
৯. স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কী কী করণীয় রয়েছে? বিবরণ দিন।
১০. ইসলামী পরিবার ব্যবস্থায় ভাই-বোনের পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ আলোচনা করুন।